উস্ওয়াতুন হাসান

আবুল হাশিম

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

পবিত্র কুরআনে মহানবী (সাঃ)-কে উস্ওয়াতুন হাসানা বা মানব চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ হিসেব বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের শেষ নবী হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন উন্নত এক মহান চরিত্রের অধিকারী। অতএব কোন কারুকার্যময় বিশেষণ অথবা কৃত্রিমতার আবরণে চিত্তাকর্ষক কোন মন্তব্যের দ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করার আদৌ প্রয়োজন নেই। মহানবীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী এবং কাজকর্ম ছিল এত বাস্তবধর্মী যে, কোন মন্তব্য ছাড়াই সে সবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা চলে এবং মহানবীর জীবন থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্যে এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। সমুদ্রের তীরে বসে যদি কেউ বিশাল সমুদ্রের দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশি দেখতে থাকে অথবা হিমালয়ের চূড়ায় উঠে কেউ যদি চারদিকে কিংবা নিঃসীম নভোনীলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন যেমন সে ভীত-বিহ্বল হয়ে তার অভিজ্ঞতা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না, ঠিক তেমনি মহানবীর জীবনও এক মহাসমুদ্র।

খ্যাতনামা পারস্যকবি ও দার্শনিক শেখ সাদী (রঃ) আরবীতে রচিত কবিতায় মাত্র চারটি লাইনে মহানবীর সাফল্য তুলে ধরেছেন। কবি সাদী মহানবীকে দেখেছেন অন্তর দিয়ে এবং পরিপূর্ণ ভক্তি, সম্মান ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে; যে ভালবাসা এবং প্রেমের বাণী তিনি ছড়িয়ে গেছেন সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর জন্যে। যে চারটি পংক্তির মধ্য দিয়ে শেখ সাদী বিশ্বনবীর জীবন চিত্রায়ন করেছেন, তার বক্তব্য হচ্ছে এইঃ

কাজের মধ্য দিয়ে মানব জাতির মধ্যে তিনি হয়েছেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর অনুপম সৌন্দর্যচ্ছটা বিদীর্ণ করেছে অন্ধকারকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহার ছিল মাধুর্যমণ্ডিত। মহানবী ও তাঁর বংশধরদের ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, জীবনে যাঁরা এক বা একাধিক ক্ষেত্রে বড় হয়েছেন। যেমন নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অপূর্ব যুদ্ধকৌশলের জন্যে সমগ্র বিশ্বের নিকট প্রেরণা ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতেন। পক্ষান্তরে আমেরিকান কবি এবং ঐতিহাসিক এনজারসোল ইতিহাসখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ানের হত্যা, অত্যাচার এবং নিপীড়নের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করার পরিবর্তে নিজেকে এমন একজন কৃষক হিসেবে কল্পনা করতে ভালবাসতেন, যে স্ত্রীর সান্নিধ্যে থেকে তার দস্তানা বুনে দিতে ভালবাসবে এবং শরতের রৌদ্রকিরণের পরশে পেকে ওঠা আঙ্গুরের ক্ষেত দেখার মাধ্যমেই লাভ করবে সুবিমল আনন্দ। সক্রেটিস দর্শনের দিক থেকে এবং বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অনন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অথচ এমনি এক অসাধারণ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বও সারারাত সুরাপানে থাকতেন বিভোর এবং তাঁর স্ত্রী জেনথিপি প্রায়ই নির্দয়ভাবে তাঁর মাথায় গরম পানি ফেলে দিতেন; গ্রীসের হোমার, পারস্যের ফিরদৌসী, ইংল্যান্ডের শেক্সপীয়ার এবং প্রাচীন ভারতের কালিদাস - এঁরা সকলেই কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু কবি কালিদাসের মৃত্যু ঘটে দক্ষিণ ভারতের এক পতিতাগৃহে। মানুষের জীবনে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করা খুবই কঠিন কিছু নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমভাবে মহত্ত্বের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করা দুর্লভ ঘটনা এবং এ বিষয়ে মরুদুলাল মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, যা ছিল একেবারেই তুলনাবিহীন।

দূর থেকে কোন জিনিস দেখতে সর্বদাই উজ্জ্বল মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সমুদ্রের ভয়াল ঢেউগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন সমুদ্রে বিছানো রূপোর পাতগুলো চমকাচ্ছে। কিন্তু মানুষের মূল্য কখনও দূর থেকে ক্ষণিকের দেখা লোকদের স্তুতি বা প্রশংসা দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মানুষ এবং তার বিষয়ে বিচারে জনগণ অনেক সময়ই হয়তো গুরুতর রকমের ভুল করে বসে এবং সত্যি

বলতে কি, আমাদের অধিকাংশ সামাজিক দুর্গতির মূলেই রয়েছে এসব কারণ।

একথা সত্য যে, কোন ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করা শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সাথে মিশবার সুযোগ পান। সেই ব্যক্তিই মহান যিনি তাঁর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভৃত্য এবং প্রতিদিনের সঙ্গী-সাথীদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

হযরত খাদিজা ছিলেন রসূলুল্লাহর যৌবনের বছরগুলোতে একমাত্র জীবনসঙ্গিনী আর আল্লাহর রসূল হিসেবে তিনি প্রথম তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেন। অনুপম শিষ্টাচার এবং মধুর স্বভাবের দ্বারা মহানবী তাঁর মহীয়সী সহধর্মিণীর নিকট শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহানবীর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা তাঁর মহান জীবনসঙ্গীকে বর্ণনা করেন কুরআনের শিক্ষার প্রতিচ্ছবি বলে। আল-কুরআন যে আদর্শ উপস্থাপন করে, মহানবী ছিলেন তারই বাস্তব দৃষ্টান্ত।

রসূলুল্লাহর পরিচারক হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, "আমি একাধারে তাঁর গৃহে দশ বছর কাজ করেছি। দীর্ঘ এই ১০ বছর সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমাকে বলেন নাই, কেন এটা তুমি করলে অথবা কেন এটা কর নাই।" বাইবেলে খ্রীস্টান ধর্মগুরুগণ যীশুখৃষ্ট এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, আমরা যারা আল-কুরআনে বিশ্বাসী, তারা সেই বিবরণ বিশ্বাস করি না। পবিত্র কুরআনের মতে হযরত ঈসা পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক এবং তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেন্ট ম্যানুসের বিবরণ মতে আমরা দেখতে পাই, যীশুখৃষ্টের শেষ ভোজনের ১২ জন সাথীর মধ্য থেকেও একজন যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং অবশিষ্টরা তাঁকে তাঁর জীবনের শেষরাতে মোরগ ডাকার আগেই একবার নয়, তিন তিন বার অস্বীকার করেন।

ইসলামের মহান নবীর নিজস্ব শিষ্য-সাথী ছিলেন, ইতিহাসে যাঁরা সাহাবারূপে পরিচিত। সংখ্যায় তাঁরা ১২ জন নয়, ১২ শতেরও বেশী। রসূলুল্লাহ তাঁর সাহাবাদের নিকট নিজেকে গোপন করতেন না, বরং মানব জাতির কল্যাণে তিনি সাহাবাদের নিকট প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় নিজের জীবনধারা উন্মুক্ত রাখেন। মহানবীর পূত চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের এটা কি একটা বিস্ময়কর নিদর্শন নয়? মহানবীর কোন সাহাবার মনে কস্মিনকালেও রসূলুল্লাহ কিংবা তাঁর কাজের সামান্যতম ক্ষতি সাধন করার চিন্তা উদয় হয়নি। মহানবীর প্রতি এমনি ধরনেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসা ছিল সাহাবাদের।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মহানবীর গুরুতর শত্রু আবু লাহাব এবং আবু জেহেল, যারা চিরকাল তাঁর রক্তমাংস কামনা করেছে, এইরূপ শত্রুরাও অন্তরে অন্তরে এই মহান শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ না করে পারত না। একদা জনৈক বেদুঈন আবু লাহাবের নিকট কিছু সংখ্যক উট বিক্রয় করেছিল; কিন্তু আবু লাহাব বেদুঈনের প্রাপ্য পুরোপুরি পরিশোধ না করায় বেদুঈন মহানবীর নিকট এ ব্যাপারে সহায্য প্রার্থনা করেন। মহানবী দরিদ্র বেদুঈনের অসহায়তায় ব্যথিত হয়ে আবু লাহাবকে বেদুঈনের পাওনা টাকা চুকিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। আবু লাহাব দ্বিরুক্তি না করে সাথে সাথে মহানবীর অনুরোধ মেনে নিয়ে বেদুঈনের টাকা পরিশোধ করে দেন। এই সব ঘটনা মহানবীর মহত্ত্বের উজ্জ্বলতম প্রমাণ। মহানবীর চরিত্রের এই অনুপম রুপমাধূর্যের জন্যেই পবিত্র কুরআনে তাঁকে "উস্‌ওয়াতুল হাসান" অর্থাৎ মানব চরিত্রের অনূপম আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

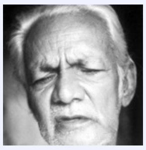

আবুল হাশিম

আবুল হাশিম ১৯০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের কাশিয়াড়ায় জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবুল কাশেম বর্ধমানের কংগ্রস নেতা ছিলেন।
১৯২৩ সালের বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল থেকে আবুল হাশিম ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে,কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২৫ সালে আই এ এবং ১৯২৮ সালের বি এ পাস করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে বি এল ডিগ্রি লাভ করে বর্ধমান আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন।
আবুল হাশিম ১৯৩০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা হিসেবে যোগ দেন। মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে তিনি এর উদারপন্থী অংশ গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। অনেক প্রগতিশীল বাঙালি মুসলিম তরুণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি বর্ধমান থেকে নির্দলীয় পার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বঙ্গীয় আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে তিনি বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও ১৯৪২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালের ৭ নভেম্বর মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে দাবী না করে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকায় পৃথক পৃথক স্বাধীন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। সেই হিসেবে বাংলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবার কথা। কিন্তু ১৯৪৬-এর নির্বাচনে বিজয়ের পর ১৯৪৬ এর ৯ এপ্রিল দিকে দিল্লীতে আহুত মুসলিম লীগের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সভায় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র পরামর্শে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র এই প্রস্তাব উত্থাপনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম খুব দৃঃঢ়ভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। এরপর ভাষাভিত্তিক স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রচেষ্ঠায় আবুল হাশিম বাঙালি কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সাথে দেখা করেন। এদিকে ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের তার চীফ অফ স্টাফ লর্ড ইসমকে ভারত বিভাগের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেন। এই পরিকল্পনাটি □প্ল্যান বলকান□ নামে পরিচিত। এই প্লান বলকান অনুযায়ী ভারতকে দুইয়ের অধিক অংশে বিভক্ত করার কথা হয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তানকে দুই অংশে বিভক্ত করা এবং এর যে কোন অংশের অন্তর্গত কোন প্রদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হতে চাইল তার ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু ও কংগ্রেসের তীব্র বিরোধীতা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করে। ১৯৪৭ সালের১০ মে আবুল হাশিম শরৎচন্দ্র বসুর সাথে মহাত্মা গান্ধীর সাথে তার সোদপুর আশ্রমে দেখা করেন। সেখানে আবুল হাশিম গান্ধীর নিকট সাধারণ ভাষা, সাধারণ সংস্কৃতি এবং সাধারণ ইতিহাস যা হিন্দু মুসলমান উভয়কে একসূত্রে আবদ্ধ করেছিল□ তার উপর ভিত্তি করে যুক্ত বাংলার উপর তার বক্তব্য তুলে ধরেন।
১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন। এরপর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।১৯৫২ সালে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকায় তিনি ১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন এবং প্রায় ১৬ মাস কারাভোগের পর মুক্তিলাভ করেন। এরপর থেকে তিনি খেলাফতে রাব্বানী পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ পার্টির সভাপতি ছিলেন।
আইয়ুব খানের শাসনামলে আবুল হাশিম ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক ছিলেন। এ পদে থাকার সময়ে তাঁর উদ্যোগে কুরআন শরীফের মূল আরবি থেকে বাংলায় তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ও তিনি আইয়ুব খানের বাঙালি বিরোধী কার্যক্রমের প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পাকিস্তান সরকারের বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের ঘোষণা করলে তিনি এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান।
তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলোঃ দ্যা ক্রিড অফ ইসলাম (The Creed of Islam) -১৯৫০, এ্যাজ আই সি ইট (As I See It)□ ১৯৬৫, ইনটিগ্রেশন অফ পাকিস্তান (Integration of Pakistan)-১৯৬৭, অ্যারাবিক মেইড এসে (Arabic Made Eassy)□১৯৬৯, রব্বানীর দৃষ্টিতে-১৯৭০, ইন রেট্রোস্পেকশন (In Retrospection)-১৯৭৪। আবুলহাশিম ১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেন।